অনিবার্য ইবনে খালদুন ও অন্যান্য

α

অনিবার্য ইবনে খালদুন ও অন্যান্য

মুসা আল হাফিজ

রূপসী বাংলা

প্রকাশক: রূপসী বাংলা
৩৮ পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০
০১৭১০৭৭৯০৫০
অনিবার্য ইবনে খালদুন ও অন্যান্য
১ম প্রকাশ: ৬ মাঘ ১৪৩০; ২০ জানুয়ারি ২০২৪
© মুসা আল হাফিজ
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ
মূল্য: ৫৫০ টাকা
Anibarjo Ibne Khaldun O Onnanyo (Published in Bengali)
by *Musa Al Hafij*
Published by Ruposhi Bangla
38 P. K. Ray Road, Banglabazar (1st floor), Dhaka 1100
ISBN:

সূচি

জ্ঞানবিনাশের মিথ ও ইসলাম
আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞানসম্পদ ধ্বংসের মিথ ও মুসলিম বিজয় : একটি দৃষ্টিপাত
জান্দিশাপুরে জ্ঞানহত্যার মিথ ও মুসলিম বিজয়
বখতিয়ার খিলজি কি লাইব্রেরী ধ্বংস করেছিলেন?
গ্রন্থ নিষিদ্ধকরণ : ইসলামোফোবিক বয়ানের চেহারা!
চিন্তা ও নির্মিতি
অনিবার্য ইবনে খালদুন (এক)
অনিবার্য ইবনে খালদুন (দুই)
অনিবার্য ইবনে খালদুন (তিন)
অনিবার্য ইবনে খালদুন (চার)
ইবনে খালদুন কীভাবে হান্টিংটনের প্রতিকার?
ইবনে খালদুনের ঐতিহাসিক রূপকল্প ও বাংলাদেশের ইতিহাসের পুনর্পঠন
ইবনে খালদুনের চিন্তার আলোকে সাহিত্যের নবনির্মাণ
ধর্ম ও বিজ্ঞান : দোস্তি না কুস্তি
বিজ্ঞানকে কোন নজরে দেখে ইসলাম?
ধর্ম ও বিজ্ঞান : দ্বন্দ্ব না সমন্বয়?
পাশ্চাত্যে বৈজ্ঞানিক জাগরণে ইসলামের প্রভাব
বিজ্ঞান চাই, বিজ্ঞানবাদ নয়
আধুনিকতা, উত্তরাধুনিকতা: দেখা-অদেখা
আধুনিকতার ক্ষতস্থান
আধুনিকতা শেষ কথা নয়
সাংস্কৃতিক সংযোগে উত্তরাধুনিকতার সীমাবদ্ধতা
না আধুনিকতায়, না উত্তরাধুনিকতায়
পশ্চিমা সভ্যতার আদর্শিক শূন্যতা
ধর্মনিরপেক্ষতাকে যে জবাব দিতে হবে

পথ ও প্রকরণ
মুসলিম ইতিহাসের পুনর্গঠন : নীতি ও তত্ত্ব
উন্নয়ন, অর্থনীতি: ভাবনার পথরেখা
মালেক বিন নবীর উন্নয়নতত্ত্ব ও মুসলিম বিশ্বের চিন্তাসংকট
কম অধিকার, বেশি উন্নয়ন : তত্ত্ব ও বিচার
বৈশ্বিক পানি সংকট, সম্ভাব্য পানিযুদ্ধ, প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
সামুদ্রিক অর্থনীতি ও বাংলাদেশ
ঢাকায় ধুলার অত্যাচার : একটি প্রতিকার প্রস্তাব
পাকিস্তান: অর্থনীতির পুনর্গঠনের পথ
অর্থব্যবস্থার পুনর্গঠনে নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকীর প্রকল্প
সংস্কৃতি, সাহিত্য : বিহঙ্গ বীক্ষণ
বাংলাদেশের কবিতায় সুফিপ্রভাব
জন ফসের মনোগঠন ও সৃষ্টিস্বাতন্ত্র
বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বাপর: সাংস্কৃতিক রূপান্তর
জল আর পানির বিতণ্ডা প্রসঙ্গে
আমির আজিজ ও গণকণ্ঠের বাণীভাষ্য
আজাদি : পথের বানান
কালচারাল হেজিমনি ও রাজনৈতিক দাসত্ব
বি-উপনিবেশায়ন : পাড়ি দিতে হবে বহু পথ
প্রতীচ্যবাদ ও চৈন্তিক পুনর্গঠন
মানবজাতির জন্য এক অমোঘ জীবনাদর্শ

জ্ঞানবিনাশের মিথ ও ইসলাম

আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞানসম্পদ ধ্বংসের মিথ ও মুসলিম বিজয়: একটি দৃষ্টিপাত

বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে বিবিধ কাজ করেছেন অ্যালান চাপম্যান। বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের ইতিহাসকে তিনি স্বচ্ছ করতে চান। তার বিখ্যাত এক বই Slaying the Dragons। ড্রাগনকে তিনি শেষ করতে চান। কোন ড্রাগনকে কোথা থেকে শেষ করবেন? বইটির শিরোনামেই তিনি জানাচ্ছেন ড্রাগনটি হলো মিথ, তাকে তিনি ধ্বংস করবেন বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের ইতিহাস থেকে। বইটির সাবটাইটেল তিনি দিয়েছেন Destroying Myths In The History Of Science And Faith। অভিনন্দনযোগ্য অভিপ্রায়। কিন্তু মুশকিল হলো অ্যালান চাপম্যান নিজেই মিথের শিকার হয়েছেন। এর চর্চা করেছেন। ফলে শিকারি নিজেই শিকারে পরিণত হয়েছেন। বইটির বিভিন্ন জায়গায় মিথের প্রতিপত্তির সামনে অবনত লেখকের ঐতিহাসিক সত্তার করুণ দুর্দশা লক্ষ করা যেতে পারে। প্রধান এক জায়গা হলো আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার। তার ধ্বংস প্রসঙ্গে অ্যালান লেখেন:

আরব থেকে ইসলামের মৌলিক সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার মহান গ্রন্থাগারের অবশিষ্ট অংশে আগুন লাগিয়ে দেন খলিফা ওমর। ধ্রুপদ এই ধ্বংসজ্ঞের ফলে চিরকালের জন্য কোন জ্ঞানসম্পদ হারিয়ে গিয়েছিল, সেটা ভালোভাবে জানে ভূমধ্যসাগরের চারপাশ। আল্যানের এ বক্তব্যই ঘুরে-ফিরে হাজির হয়েছে রিচার্ড ওভেনডেন BURNING THE BOOKS: A History of Knowledge Under Attack গ্রন্থে। তিনিও গল্পটি উল্লেখ করেছেন এবং তার মতে, এটি কিংবদন্তি নয়।

কিন্তু এটি আসলে বানানো গল্প। নিরেট গুজব। এই গুজব তৈরি হয় মুসলমানদের মিসর জয়ের ৫০০ বছর পরে। তৈরি করেন বাগদাদের ডাক্তার, পণ্ডিত ও গল্পকার আবদুল লতিফ মুওয়াফফাক উদ্দীন (১১৬২-১২৩১ খ্রি.)। ৫৯৫ হিজরিতে তিনি মিসর ভ্রমণ করেন। লেখেন এক বই, যার নাম আল ইফাদাহ ওয়াল ইতেবার। এতে তিনি চমকপ্রদ কাহিনি বর্ণনার ঝোঁক দ্বারা পীড়িত ছিলেন। একটি হাদিস তিনি সাজিয়ে নিলেন। দাবি করলেন ওমর (রা.)-এর আদেশে আমর ইবনুল আস (রা.) আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগার পুড়িয়ে দেন। কিন্তু হাদিসের নতুন ভাষ্য সামনে আনার সুযোগ ছিল না ঘটনার ছয় শতাব্দী পরে। নতুন করে হাদিস জন্ম নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কোনো বিষয়ে যদি বলা হয় হাদিস আছে, তাহলে এর মানে হলো প্রাথমিক সময় থেকেই হাদিস ছিল। বর্ণনার পরম্পরা ছাড়া দীর্ঘকাল পরে সঠিক হাদিস জন্ম নেওয়া অসম্ভব। ফলে আবদুল লতিফের দাবি পাত্তা পায়নি সমকালে। যদিও আল কিফতি (১১৭২-১২৪৮ খ্রি.) একে প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আবদুল লতিফের মৃত্যুর অর্ধশতক পরে সিরিয়ার অর্থোডক্স চার্চের ফাদার ইবনুল উবারি (১২২৬-১২৮৬) একটি মুখরোচক গল্প সাজালেন। ইবনুল উবারির সাজানো গল্পটি ঠিক পৌরাণিক কাহিনির মতো। তিনি লেখেন: ইয়াহিয়া আল নাহাবি বা জন দ্য গ্রামারিয়ান নামে এক বুদ্ধিজীবী ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। মুসলমানরা মিসর জয় করলে তিনি গেলেন বিজয়ী সেনাপতি আমর ইবনুল আসের কাছে। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি থেকে বইগুলো যেন তাকে নিতে দেওয়া হয়, সেই অনুরোধ করেন সেনাপতির কাছে। আমর ইবনুল আস (রা.) বললেন এ জন্য ওমর (রা.)-এর অনুমতি লাগবে। তখনকার খলিফা ছিলেন ওমর (রা.)। তার কাছে যখন বিষয়টা উপস্থাপন করা হলো, তিনি বললেন, লাইব্রেরিতে যে জ্ঞান আছে, তা যদি আল কুরআনে থাকে, তাহলে লাইব্রেরির দরকার নেই। আর যদি সেই জ্ঞান আল কুরআনের বাইরের কিছু হয়, তাহলেও এ লাইব্রেরির দরকার নেই। ফলে লাইব্রেরির সব বই পুড়িয়ে ফেলা হলো। গোসলের পানি গরম করার জন্য এসব বইকে দগ্ধ করা হলো ছয় মাস ধরে।

গল্পটি প্রথমবার উচ্চারিত হয় ঘটনার প্রায় ছয় শ বছর পরে। কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর সমস্যা হলো আমর ইবনে আস (রা.) যখন মিসরে প্রবেশ

করেন, তখন ইয়াহইয়া আন নাহবি মারা গেছেন। তার মৃত্যু হয় ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে, যে বছর জন্ম হয় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর। আমর ইবনুল আস (রা.) মিসরে প্রবেশ করেন ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে। ইয়াহইয়ার মৃত্যু ও আমর (রা.)-এর মিসর জয়ের মধ্যখানে ৭২ বছরের ব্যবধান। ফলে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইবেরিরির বইয়ের জন্য ইয়াহইয়ার অনুরোধ, আমরের (রা.) জবাব, ওমরের (রা.) প্রত্যাখ্যান...সবই উর্বর কল্পনা, সাজানো গল্প।

সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতক অবধি কেউই কাহিনিটির উল্লেখ করেননি। বিশেষত খ্রিষ্টান ও রোমান সূত্রগুলো এমন ঘটনাকে কখনোই উপেক্ষা করত না। এমনকি মুসলিম সূত্রও তা করত না। ঘটনাটি যেহেতু আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের মতো বিশাল ঐতিহ্যকেন্দ্রে ঘটেছে এবং তা যেহেতু রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে হয়েছে, ফলে একদিক থেকে তা রোমান ও মিসরীয় আবেগকে স্পর্শ করত, অপরদিকে ওমরের (রা.) রাষ্ট্রিয় ফয়সালা মুসলিম আইনকে প্রভাবিত করতো। আইনের নজির হিসেবে এর উল্লেখ হতে থাকত। কারণ এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্তকেও উল্লেখের আওতার বাইরে রাখা হয়নি। ওমর (রা.)-এর রাষ্ট্রীয় ফরমানগুলো সমকালীন ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। সেখানে গুরুতর এই আদেশ উল্লেখের অযোগ্য বলে বিবেচিত হতো না কোনো তরফেই।

ফলে মুসলিমদের হাতে লাইব্রেরি ধ্বংসের গল্পটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। বিভিন্ন লেখক একে আজগুবি মিথ্যাচার হিসেবে শনাক্ত করেছেন। ১৭০০ সালে ইউরোপে এডওয়ার্ড গিবন যেমন একে সাজানো গল্প হিসেবে দেখান, তেমনি ১৮৯৪ সালে হিন্দু লেখক বাসুদেব রাউ একই কাজ করেন। ১৯০৬ সালে তুর্কি লেখক মুহাম্মদ মনসুর মাকতাবেত ইস্কান্দারিয়া নামক গ্রন্থে বিষয়টাকে ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করেন। দেখান এর ঐতিহাসিক ভিত্তিহীনতা। ১৯০২ সালে আলফ্রেড বাটলার, ১৯৯৮ সালে আবদুর রহিম আলী বিষয়টাকে আরও স্পষ্ট করেন। শিবলী নোমানীর কুতুবখানায়ে ইস্কান্দারিয়া ছিল এ ধারার এক প্রভাবশালী গবেষণা। বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে মীমাংসিত এবং স্পষ্টই প্রমাণিত যে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ধ্বংসের সাথে মুসলিমদের কোনোই সম্পর্ক নেই। এ-সম্পর্ককে কল্পনা করে যে রটনা

ছড়ানো হয়, বিচারশীল ঐতিহাসিকতা তাকে আবর্জনার পাত্রে ফেলে দেয়। কিন্তু একে জিইয়ে রাখার মরিয়া চেষ্টা করছেন কিছু লেখক। বাংলাদেশে হুমায়ুন আজাদ ও তার কিছু অনুসারী এ কাজে যুক্ত থেকেছেন। যদিও ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের মতো পণ্ডিতও বিষয়টিকে প্রচারের সুযোগ হাতছাড়া করেননি। এই চেষ্টার সাথে ইসলামোফোবিয়ার সম্পর্ক গভীর ও তীব্র।

আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি ধ্বংসের দায় ইসলামের ওপর চাপানোর উদ্যম বেড়েছে মূলত লাইব্রেরিটির গুরুত্বের কারণে। প্রাচীন পৃথিবীর অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই লাইব্রেরি ধ্বংস অবশ্যই বর্বরতা। সেই বর্বরতার দায়ভার ইসলামের ওপর চাপানোর লক্ষ্যে যেকোনো খড়কুটোকেও আঁকড়ে ধরতে চাইবে ইসলামোফোবিয়া। ইবনুল উবারির পৌরাণিক গল্পটা তার জন্য সেই খড়কুটো। কিন্তু এর অসারতা নিয়ে এগোনো যাবে না বলেই হিস্ট্রি অব এরাবস এ পি কে হিট্টিকেও স্বীকার করতে হয়,

'খলিফার আদেশে আমর দীর্ঘ ছয় মাস ধরে শহরের অগণিত লোকের গোসলের পানি গরমের চুল্লি জ্বালানোর কাজে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের বইপত্র ব্যবহার করেছিলেন—এই গল্প অলীক কাহিনি হিসেবে মজাদার হলেও ইতিহাস হিসেবে আবর্জনা।

বার্ট্রান্ড রাসেল লেখেন: 'আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি খলিফা ধ্বংস করেছিলেন এই গল্প সব খ্রিষ্টানকেই শেখানো হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, এই লাইব্রেরি বারবার ধ্বংস হয়েছে, আবার গড়া হয়েছে। প্রথম একে ধ্বংস করেন জুলিয়াস সিজার, আর সর্বশেষে যখন একে ধ্বংস করা হয়, তখন ইসলামের নবীর জন্মও হয়নি। (HUMAN SOCIETY IN ETHICS AND POLITICS; P. 218 (ROUTLEDGE, 2013)

বস্তুত আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ধ্বংস হয় ইসলামের আবির্ভাবেরও দুই শ বছর আগে!

এই লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন টলেমি সুটার। সম্রাট আলেকজান্ডারের সেনাপতি ছিলেন তিনি। প্রথম টলেমি নামে তিনি বিখ্যাত। মিসরের শাসক ছিলেন তিনি। আলেকজান্দ্রিয়া শহর প্রতিষ্ঠা তারই কাজ। এই রাজবংশ ২৭৪ বা ২৭৫ বছর মিসর শাসন করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০ সব

অবধি তাদের শাসনকাল। এই বংশের শেষ শাসক ছিলেন ক্লিউপেট্রা, যিনি রোমান নেতা অক্টেভিয়ানের হামলায় পরাজিত হন এবং আত্মহত্যা করেন। খ্রিষ্টপূর্ব ২৮৮ অব্দে প্রথম টলেমি প্রতিষ্ঠা করেন আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি। একে তৈরি করা হয় এথেন্সে অ্যারিস্টটলের যে বক্তৃতা কক্ষ ছিল, তার আদলে। প্রথম দিকে তা ব্যবহৃত হতো গ্রিক দেবী মুসের মন্দির হিসেবে, যাকে মনে করা হতো কাব্য, সংগীত ও সাহিত্যের দেবী। ধীরে ধীরে এখানে জ্ঞানদানের কাজও চলতে থাকে। লাইব্রেরিও সমৃদ্ধ হয়। শহরের অভিজাত অংশে ছিল এর অবস্থান। আলেকজান্দ্রিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সেরাপিয়াম অংশে ছিল এই লাইব্রেরি। একে মনে করা হয় আধুনিক জাদুঘরের পূর্বসূরি। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও প্যাপিরাস স্ক্রোলে তা ছিল সমৃদ্ধ। এখানে অধিকাংশ বই রাখা হয় প্যাপিরাস স্ক্রোলের আকারে। তবে ঠিক কতগুলো স্ক্রোল এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল তা জানা যায় না। ধারণা করা হয় দ্বিতীয় টলেমির মৃত্যুকালে সেখানে ছিল পাঁচ লাখ পুঁথি। সব ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের জন্য এটি ছিল উন্মুক্ত। লাইব্রেরি ছাড়াও এখানে ছিল মিলনায়তন, বাগান ও মন্দির। ইউক্লিড, আর্কিমিডিস এরিসথনিসসহ প্রাচীন জ্ঞানের বহু দিকপাল এখানে জ্ঞানচর্চা করেন, জ্ঞানলাভ করেন। প্রধানত মিসরীয় ও গ্রিক দর্শন, রাজনীতি, কাব্য, নাটক, সংগীত, জ্যোতির্বিদ্যা, পৌরাণিক কাহিনি, গণিত, ইতিহাস, ভূমি বিষয়ক নথি, দেবতাস্তুতি, সামাজিক আইন, কামকলা, চিত্রকর্ম, যুদ্ধবিদ্যা, পূজা-পার্বণ ইত্যাদির মতো নানা বিষয়ের সংগ্রহগুলো লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধ করেছিল। গ্রিক সংগ্রহ দিয়ে একে সমৃদ্ধ করেন ডিমিট্রিয়াস, যিনি ছিলেন অ্যারিস্টটলের ছাত্র। এসব সংগ্রহ নানা ভাষায় অনূদিত হতো এবং এ নিয়ে নবসৃষ্টির কাজও হতো। সম্পাদনা করা হতো প্রাচীন গ্রন্থ। হোমারের গ্রন্থ সম্পাদনা এ লাইব্রেরির কৃতিত্ব। বিখ্যাত সম্পাদকেরা প্রধান গ্রন্থাগারিক উপাধি পেতেন। তাদের অন্যতম ছিলেন জেনোডোটাস, রোডসের অ্যাপোলোনিয়াস, এরাটোস্থেনিস, বাইজান্টিয়ামের অ্যারিস্টোফেনস ও সামোথ্রেসের অ্যারিস্টারকাস। ফিলোক্রেটিসের কাছে অ্যারিস্টিয়াস রচিত বিখ্যাত চিঠি লেটার্স অব অ্যারিস্টিয়াস এ গ্রন্থাগার সম্পর্কে জানার সবচেয়ে প্রাচীন অবলম্বন। খ্রিষ্টপূর্ব ১৮০-১৪৫ অব্দে তা রচিত হয়। হেলেনিস্টিক এই

রচনাকে বাইবেলের পণ্ডিতরা ছদ্মরূপী চিঠি বলে আখ্যায়িত করেন। চিঠিটি জানায়, টলেমি প্রথম সোটারের (৩২৩-২৮৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) অথবা তার পুত্র টলেমি দ্বিতীয় ফিলাডেলফাসের (২৮৩-২৪৬ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ) রাজত্বকাল ছিল এ লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশকাল এবং স্বর্ণযুগ। তবে এই স্বর্ণযুগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

রোমানদের মিসর আক্রমণের সময় পর্যন্ত এই গ্রন্থাগার কার্যকর ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮ সালে জুলিয়াস সিজারের নৌযুদ্ধে লাইব্রেরিটি অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়। বিস্তর ক্ষতি ও ক্ষয়ের মধ্যেও লাইব্রেরিটি নিজেকে টিকিয়ে রাখে আরও কয়েক শতক। ২৭০ খ্রিষ্টাব্দে আরেলিয়ান আক্রমণের সময় লাইব্রেরিটি প্রচণ্ডভাবে ক্ষতির কবলে পড়ে। অবশেষে এল ৩৯১ খ্রিষ্টাব্দ; সম্রাট থিওডোয়াসের ধ্বংসযজ্ঞের বছর। তিনি ৩৮৯ সাল থেকে ৩৯২ সাল পর্যন্ত পূর্ব রোমান অঞ্চল এবং পরে ৩৯৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় অঞ্চল শাসন করেন। ৩৯১ সালে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ থিওফিলাসের এক চিঠির জবাবে মিসরের ইহুদি ও প্যাগান ধর্মালয় ধ্বংস করে দেওয়ার আদেশ জারি করেন। খ্রিষ্টধর্মকে সমর্থন করে না, এমন সব গ্রন্থ পুড়িয়ে দেওয়ারও আদেশ করেন। কপটিক পোপ থিওফিলাস ও তার উন্মত্ত অনুসারীরা ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করলেন। চারদিকে মৃত্যু ও বিনাশের স্রোত বয়ে যায়। থিওফিলাসের নির্দেশে অগ্নিসংযোগে লাইব্রেরি ধ্বংস করা হয়। প্রথম অগ্নিসংযোগ লাইব্রেরির সবকিছু ছাই বানাতে পারেনি। ফলে দ্বিতীয়বার অগ্নিসংযোগ করে লাইব্রেরির সমাপ্তি নিশ্চিত করা হয়।

আলেকজান্দ্রিয়ার রাজপথে আগুনের উৎসব হয়। বহু শতকের সঞ্চিত জ্ঞানভান্ডারকে পুড়িয়ে ধর্ম রক্ষার সান্ত্বনা নিয়ে থেওফিলাসের অনুসারীরা ঘরে ফেরে। এরই মধ্যে গোপনে অগ্নিদাহ থেকে সিরামপিয়াম নামে গণিত ইত্যাদির কিছু বই রক্ষা করেন গণিতবিদ থিউন। ধ্বংসকালে তিনি ছিলেন লাইব্রেরির পরিচালক। থিউনের মহিম কন্যা ছিলেন হাইপেশিয়া। আনুমানিক ৩৭০ খ্রিষ্টাব্দে হাইপেশিয়ার জন্ম। বাবার শিক্ষকতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করেন তিনি। জ্ঞানের জন্য তিনি রোম সাম্রাজ্য ভ্রমণে বের হন এবং এথেন্সে উপনীত হন। সেখানে এক বিদ্যালয়ে শুরু করেন শিক্ষকতা। খুব জনপ্রিয় হন তিনি

এবং তার খ্যাতি আলেকজান্দ্রিয়ায়ও পৌঁছায়। আলেকজান্দ্রিয়া তাকে গণিতের শিক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণ করেন। তিনি আপন জন্ম শহরের স্কুলের আবেদনকে গ্রহণ করেন। এখানেও শিক্ষকতায় লাভ করেন খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা। গণিতের ওপর কিছু অসাধারণ কাজ করেন তিনি। জ্যোতির্বিদ্যা নিয়েও করেন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলোকপাত। টলেমি, দায়োফান্তাস, এপোলোনিয়াস, অ্যারিস্টটল, প্লেটো প্রমুখের চিন্তা ও কাজের ওপর তিনি আলোচনা করতেন। নব্য প্লেটোবাদের অন্যতম প্রবক্তা হয়ে ওঠেন তিনি। শিক্ষকতার জন্য টাকা নিতেন। সমাজের অভিজাত ও সাধারণ স্তরে অগণিত শিক্ষার্থী ছিল তার। সিরিনের সাইনেসিস ছিলেন তার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র। জ্ঞান-বিজ্ঞানে হাইপেশিয়া নতুন প্রগতির আবহাওয়া ছড়িয়ে দেন।

মিসরে তখন খ্রিষ্টান আধিপত্য বাড়ছে। পৌত্তলিক ও ইহুদিদের ওপর চলছে অত্যাচার। পৌত্তলিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী একজন হিসেবে চিহ্নিত করা হলো হাইপেশিয়াকে। ৩৯১ সালে চলতে থাকা ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ হয়েছিল ৩৯৩ সালে মিসরের আইনসভায় প্রণীত এক বিধানের মাধ্যমে। জনগণ এরপর শান্তিতে ছিল কিছুদিন। কিন্তু ৪১২ সালে আবারও শুরু হলো প্রলয় ও বিনাশ। আলেকজান্দ্রিয়ার নতুন বিশপ হলেন সিরিল। ৪৪৪ খ্রিষ্টাব্দ অবধি তিনি ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার প্রধান বিশপ। তার রুদ্ররূপ ছিল ভয়ানক। নির্মমতা ছিল অতীতের চেয়েও কঠিন। হাইপেশিয়াকে তিনি ঘৃণা করতেন প্রচণ্ড। আলেকজান্দ্রিয়ায় খ্রিষ্টধর্মের আধিপত্যের জন্য তার যুক্তি, বিজ্ঞান, দর্শন ও চিন্তাচর্চাকে তিনি হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেন। কারণ হাইপেশিয়ার যুক্তিবাদে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন সিরিলের অনেক অনুসারী। সিরিল নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন, হাইপেশিয়ার বক্তব্য শোনা যাবে না। কারণ তিনি সাপের চেয়েও ধূর্ত, বিপজ্জনক।

সিরিলের আরেক শত্রু ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক অরিস্টিস। তিনি আবার ছিলেন হাইপেশিয়ার খুব ঘনিষ্ঠ। ফলে সিরিল চাইলেন হাইপেশিয়ার মৃত্যু। ধর্মদ্রোহিতার নামেই সেটাকে নিশ্চিত করতে হবে। তিনি তার অনুরাগী পিটারকে লেলিয়ে দিলেন হাইপেশিয়ার পেছনে। সে তক্কে তক্কে অনুসরণ করছিল তাকে। ৪১৫, কিংবা ৪১৬ সালের একদিন। নির্জন এক জায়গায়

ঘোড়ার গাড়িতে পাওয়া গেল বিজ্ঞানীকে। দলবল নিয়ে পিটার তাকে পাকড়াও করল। টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এল চার্চে। বিজ্ঞানীর কাপড়-চোপড় খুলে একেবারে নগ্ন করা হলো। তারপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তুলে ফেলা হলো তার শরীরের চামড়া। শরীরের মাংস খসানো হলো একটু একটু করে। এভাবে অত্যাচার চলতে থাকল তার শেষনিশ্বাস পর্যন্ত। হাইপেশিয়া যখন কাতরাতে কাতরাতে মারা গেলেন, তখনো তাদের ক্রোধ অবসিত হয়নি। সিরিলের আদেশে তার মৃতদেহ টুকরো, টুকরো করা হলো। তারপর টুকরোগুলো নেওয়া হলো সিনারন নামের একটি জায়গায়। সেখানে তা পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হলো। এরপর মিসরে নিশ্ছিদ্র বর্বরতা চলছিল অব্যাহতভাবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তি ও প্রগতির প্রচেষ্টা সমূহ মুখ থুবড়ে পড়েছিল। অন্ধকার তার সব নৃশংসতা নিয়ে শাসন জারি রেখেছিল। এ শাসনের অবসান হয় ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে। যখন আমর ইবনুল আস (রা.) মিসর জয় করেন।

সৈয়দ আমির আলী তার স্পিরিট অব ইসলাম গ্রন্থে এ ঘটনার পরবর্তী পরিস্থিতির ওপর উপসংহার টেনেছেন এভাবে: 'এই ভয়ংকর রোমহর্ষক কাজের উসকানি দিয়েছিল যেই দানব, খ্রিষ্টান জগতে সে পেয়েছে মহাত্মা ধর্মপুরুষের সম্মান, আর দেখা গেল অবশেষে হাইপেশিয়ার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে আমর বিন আস (রা.)-এর তরবারি।

আমর (রা.) যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় বিজয়ী হয়ে প্রবেশ করেন, সেখানে কোনো লাইব্রেরি ছিল না। মিসরে তারপর জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং যুক্তি ও চিন্তাচর্চার নতুন যুগের সূচনা হলো এ বিজয়ের কল্যাণেই! কিন্তু এ বিজয়কেই কলঙ্কিত করা হচ্ছে এমন অভিযোগ দিয়ে, যা মূলত চার্চের বর্বরতা!

ইসলামকে সভ্যতার প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখানোর চেষ্টার সাথে এর গভীর সম্পর্ক। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ধ্বংসের মিথ দিয়ে ইসলাম ও মুসলিমসভ্যতাকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

পি কে হিট্টিও স্বীকার করছেন, আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমীয় বিশাল গ্রন্থাগারটি প্রায় ৪৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জুলিয়াস সিজার পুড়িয়ে দেন। অপর গ্রন্থাগার যা ডটার লাইব্রেরি হিসেবে পরিচিত ছিল, সেটা প্রায় ৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াসের আদেশে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তাই আরবদের মিসর

জয়ের সময় উল্লেখ করার মতো গ্রন্থাগারই আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিল না। সে কারণেই সমসাময়িকদের কেউই আমর বা ওমরের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ খাড়া করেনি। এই কেচ্ছা প্রথমবার বর্ণনা করেন আব্দুল লতিফ আল-বাগদাদি, যার মৃত্যু হয় ৬২৯ হিজরিতে (১২৩১ খ্রিষ্টাব্দ)। তার এই কাজের পেছনের কারণ কী, তা আমরা বলতে পারছি না। তবে তার গল্পের ওপর নানা রকম রং চড়িয়ে পরবর্তী কিংবদন্তি সাজানো হয়েছে।

(দৈনিক নয়া দিগন্ত: ৬ মার্চ, ২০২৩)